ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1353-1359
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.140

উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব: মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে সমাজবাস্তবতা

সুপ্রিতা নাথ, *স্বাধীন গবেষক, শ্রীভূমি, অসম ভারত*

Received: 02.07.2025; Accepted: 07.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mahasweta Devi was not only a writer but also a committed social worker. She closely observed the everyday lives, struggles, and injustices faced by marginalized people. Drawing from these experiences, she raised her voice against dominant upper-caste communities who often oppressed the lower castes. She empowered the oppressed to take a stand against injustice. Her stories, such as 'Bhat', 'Draupadi', and 'Bichon', reflect the harsh realities of society. Through her writing, she gave voice to the voiceless and exposed societal truths. Mahasweta Devi possessed the power to inspire social change, and her legacy continues to encourage us to stand against injustice.

Keywords: Social justice, Marginalized communities, Oppression, Empowerment, Activist literature

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যের একজন স্বতন্ত্র শিল্পী। তাঁর ছোটগল্পে প্রান্তিক মানুষের জীবন, উচ্চবর্ণীয় সমাজের নিপীড়ন এবং সামাজিক বৈষম্য বাস্তবধর্মীভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রবন্ধে তাঁর কিছু নির্বাচিত ছোটগল্প বিশ্লেষণ করে সমাজবাস্তবতার প্রকাশ লক্ষ্য করা হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী সর্বদা সমাজের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সমাজের উচ্চবর্গীয় অত্যাচারীদের প্রতি বিদ্বেষ এবং নিম্নবর্গীয় পীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবী নিজেকে কেবল একজন কথাসাহিত্যিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তিনি সমাজ-বঞ্চিত মানুষদের একজন হয়ে, বঞ্চনার যথার্থ কারণ উদঘাটন করতে চেয়েছেন। লেখিকা মানবজীবনের কথকতা উপস্থাপন করতে গিয়ে তাঁর নানান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন, যার ফলে তাঁর মানবদরদী সত্তার পাশাপাশি শিল্পীসত্তাও বাংলা সাহিত্যে একটি সুন্দর জায়গা করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রতিবেদনে মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে আখতারউজ্জামান ইলিয়াসের আলাপচারিতার একটি অংশতে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন-

> "আমাকে মার্কস, এঙ্গেল্স, লেনিন, মাও-সে-তুং পড়াবার বহু চেষ্টা করা হয়েছে, পড়িনি। আমি শুধু মানুষ থেকে পাঠ নিয়েছি, শুধুই মানুষ থেকে পাঠ নিয়েছি।"[১]

লেখিকার এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপই তাঁর ছোটগল্পগুলো। সময়ের সাথে সাথে সাহিত্যের রূপ বদলালেও মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাহিত্যকে এক নতুন ক্ষেত্রে পরিচালিত করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন:

> "আমাদের মানতেই হবে সত্তরের বহিঃপ্রকাশ নিছক যুগের হুজুগ ছিল না। দেশ পুড়েছে, সময় আতপ সংগ্রহ করেছে, জীবন অসহ্য যন্ত্রণায় নীল হতে হতে বিদ্রোহী হয়েছিল—এটুকু অস্বীকার করা যাবে না। মহাশ্বেতা ঐতিহাসিকের মতো সে-সবের অনুসন্ধান করেছেন, রূপ দিয়েছেন কথাসাহিত্যে।"[২]

রচনা, বিষয়বস্তু, প্রকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যারা অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী একজন অন্যতম লেখিকা।

ভারত স্বাধীন হওয়ার বহু বছর পরেও দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়নি। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম এখনও বহাল, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে খাদ্য তথা ভাত। এই প্রেক্ষাপটে মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্পটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যকর্ম। ক্ষুধার বাস্তবতা এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামকে তিনি সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন, যা এই গল্পের কেন্দ্রীয় থিম। মহাশ্বেতা দেবী নিজে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে সরাসরি দরিদ্র মানুষের জীবন যাপন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাসই 'ভাত' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ যখন প্রাচুর্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে, অন্যদিকে আরেকটি শ্রেণি শুধুমাত্র দু'মুঠো ভাতের জন্য জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত—এই দ্বৈত বাস্তবতাকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন লেখিকা।

'ভাত' গল্পটি ১৯৮২ সালে 'ম্যানিফেস্টো' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পে লেখিকা চিরকাল ক্ষুধার্ত নিম্নবর্গের মানুষের যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা এবং বঞ্চনার চিত্র অত্যন্ত বাস্তব ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র উৎসব, একটি দুর্যোগপূর্ণ রাতে নিজের পরিবার হারিয়ে ক্ষুধার তাড়নায় শহরের পথে পা বাড়ায়। আগে একবার কলকাতা গিয়ে বাসিনী নামের এক গৃহপরিচারিকার সঙ্গে পরিচিত হওয়ায়, সে বাসিনীর সহায়তায় তার মনিবের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মনিবের বাড়িতে প্রবেশমাত্রই উচ্চবর্ণের বড়ো বউ উৎসবকে অপছন্দ করে, তার চেহারা, পোশাক এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে।

> "লোকটার চাহনি বড়ো বাড়ির বড়ো বউয়ের প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি। কী রকম যেন উগ্র চাহনি। আর কোমর পর্যন্ত ময়লা লুঙ্গিটা অত্যন্তই ছোটো। চেহারাটা বুনো বুনো। কিন্তু বামুন ঠাকুর বলল, ভাত খাবে কাজ করবে।"[৩]

যদিও পিসিমার পরামর্শে এবং বাসিনীর সুপারিশে উৎসব কাঠ কাটার সামান্য কাজ পায়, মূলত ভাত পাওয়ার আশায় সে এই সামান্য কাজ করতে রাজি হয়। গল্পে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্যের চিত্র দেখা যায়— উৎসবের মতো দরিদ্র মানুষের কাছে যেখানে একমুঠো ভাতও কষ্টসাধ্য, সেখানে ধনী পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য নির্দিষ্ট চাল ও খাবারের আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে:

> "ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়োবাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, মেজ আর ছোটোর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন চাকর ঝি-দের জন্য মোটা সাপ্টা চাল।"[৪]

এই দৃশ্য উৎসবের মনে এক ধরনের হতাশা ও লোভ তৈরি করে, যা তাকে ক্রমশ ক্ষোভ এবং হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। বাস্তব জীবন থেকে নির্মিত উৎসব চরিত্রটি প্রতিফলন করে সমাজের সেই শ্রেণির, যাদের কণ্ঠস্বর নেই, কিন্তু তাদের জীবনযাপন এক একটি প্রতিবাদ।

বাসিনী একমাত্র ব্যক্তি, যিনি উৎসবের কষ্ট বুঝে কিছু ছাতু খেতে দেন। কিন্তু যখন উৎসব ক্ষুধার্ত অবস্থায় ভাত চায়, তখন বাড়ির কর্ত্রী জানিয়ে দেন, যতক্ষণ না 'হোম' সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ কেউ ভাত খেতে পারবে না। এটি ধর্মীয় রীতিনীতির অমানবিক ব্যবহারের একটি প্রতীক। কিন্তু অবশেষে দেখা যায় এত কষ্ট করে রান্না, এত কাজ সবই যেন পণ্ড হয়ে গেলো। পরিণামে, হোম শেষ হওয়ার পরও যখন কর্তাবাবুর মৃত্যু ঘটে, তখন সমস্ত রান্না বাতিল করে ফেলে দেওয়ার কথা বলা হয়। বাড়ির কর্তী বাসিনীকে সমস্ত ভাত ফেলে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তখনই ক্ষুধায় নিজেকে সামলাতে না পেরে উৎসবের মাথায় এক বুদ্ধি এল। সে বাসিনী কে বলে এখানে সেখানে ভাত ফেললে কুকুর নষ্ট করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলবে। তাই সে নিজের হাতে ভাত ফেলতে চায় বলে মোটা চালের ভাত মাথায় করে বয়ে হাঁটা শুরু করে। বাসিনী বুঝতে পেরে যখন উৎসবের পিছু করে এবং তাকে অশুচ বাড়ির ভাত খেতে না করলে উৎসব হিংস্র হয়ে যায়।

> "উচ্ছব ফিরে দাঁড়ায়। তার চোখ এখন বাদার কামটের মতো হিংস্র। দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতোই হিংস্র ভঙ্গি করে। বাসিনী থমকে দাঁড়ায়।"[৫]

ভাত দেখে উৎসব উন্মাদ হয়ে যায়। এত দিন নিজে ক্ষুধার্ত থাকার ফলে আজ সে পেট ভরে মনের আনন্দে ভাত খেতে চায়। স্টেশনে বসে যখন সে একাকী ভাত খেতে থাকে।

> "ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গ সুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চন্নুনীর মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারে নি। খেতে খেতে তার যে কি হয়। মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত, শুধু ভাত। বাদার ভাত। বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন। আছে, আরেকটা বাদা আছে। সে বাদাটার খোঁজ নির্ঘাত পাবে উচ্ছব। আরো ভাত খেয়ে নি। চন্নুরী রে! তুইও খা, চন্নুরীর মা খাও, ছোট খোকা খা, আমার মধ্যে বসে তোরাও খা! আঃ! এবার জল খাই, জল! তারপর আরো ভাত।"[৬]

অবশেষে সে যখন ধরা পড়ে যায় এবং পিতলের ডেকচি চুরির অভিযোগে জমিদার বাড়ির কর্মচারীরা তাকে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যায়। গল্পের এই পরিণতি প্রতীকীভাবে দেখিয়ে দেয়— দরিদ্র শ্রেণির একজন মানুষ শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অধিকারটুকু অর্জন করতে গিয়েও সমাজের কাঠামোয় অপরাধী হয়ে ওঠে।

'ভাত' গল্পটি ক্ষুধা নামক একটি প্রাথমিক চাহিদার মধ্য দিয়ে সমাজের গভীর বৈষম্য, শ্রেণি-সংঘাত এবং নৈতিক পতনকে প্রকাশ করে। মহাশ্বেতা দেবী শুধু একজন লেখিকা নন— তিনি একজন মানবিক যোদ্ধা, যিনি প্রান্তিক মানুষের জীবনকে সাহিত্যের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন। এই গল্প কেবল একটি সাহিত্যকর্ম নয়, বরং একটি নির্জীব সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক আত্মিক প্রতিবাদ।

সমাজের নিম্নবর্গীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী যুগের পর যুগ ধরে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। এই জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, অবহেলিত এবং অবদমিত। মহাশ্বেতা দেবী সেই অবহেলিত আদিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সময় কাটিয়েছেন, তাদের জীবন ও সংগ্রামের শরিক হয়েছেন। তাদের জীবনের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে ফুটিয়ে তুলেছেন। তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও ক্ষমতাশালী সমাজ যেভাবে নিম্নবর্গের উপর অবিচার চালিয়ে এসেছে, তা তাঁর হৃদয়কে পীড়িত করেছে। সেই পীড়া থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর লেখায় প্রতিবাদী সুর। তিনি কলমকে করেছেন এক শক্তিশালী অস্ত্র, যা শুধু দুঃখের কাহিনি বলে না, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার আহ্বান জানায়। 'দ্রৌপদী' গল্পটি রচিত হয়েছে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখিকা এক আদিবাসী নারীর প্রতিরোধের কাহিনি বুনেছেন, যার নাম দ্রৌপদী মেজেন। তিনি কেবল একজন সাঁওতাল নারী নন, তিনি এক সংগ্রামী প্রতিচ্ছবি, যিনি যন্ত্রণায় ভেঙে পড়েন না বরং সেই যন্ত্রণাকে শক্তিতে পরিণত করেন।

গল্পের শুরুতেই দেখা যায় দ্রৌপদী পলাতক, কারণ সে ও তার স্বামী দুলন স্থানীয় প্রভাবশালী সূর্য সাহুর খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত। তারা দু'জনই খুব সাধারণভাবে বাঁচতে চেয়েছিল, একটি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনই ছিল তাদের চাওয়া। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে সূর্য সাহু স্থানীয় বিডিওএর সঙ্গে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ, প্রাথমিকভাবে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের আড়ালে জলের কুয়া ও টিউবওয়েল নির্মাণ করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা আদিবাসীদের উপর আরও দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সূর্য সাহু তাদের এলাকায় দুটি টিউবওয়েল ও তিনটি কুয়া নির্মাণ করে, কিন্তু তা আদিবাসীদের জলের চাহিদা মেটানোর জন্য নয় বরং শোষণের নতুন এক ফাঁদ। সেই সময় বীরভূমে প্রচণ্ড খরা, জলের চরম অভাব। কৃষিকাজ বন্ধ, খাদ্যের অভাব তীব্র। আদিবাসীরা যখন সূর্য সাহুর কাছে জল চায়, সে জানায় জলের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে। এই নির্মম সিদ্ধান্ত তাদের মনে প্রতিবাদের বীজ বুনে দেয়।

> "যাও, যাও। তোমাদের পঞ্চায়েতী বদমাশি আমি মানি না। জল নিয়ে চাষ বাড়াব। আধা ধান আধিয়ার লিবে।"[৭]

অবশেষে অনেক চেষ্টার পরেও যখন জল পাওয়া যায় না, তখন আদিবাসীরা বিশ্বাস করে সূর্য সাহুকে খুন করাই তাদের একমাত্র পথ। এই হত্যার মাধ্যমে তারা শোষণের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত প্রতিবাদ জানায়।

> "দুলনা বলেছিল, আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দেই। দ্রৌপদী বলেছিল, মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি উপড়াব।"[৮]

সূর্য সাহুর মৃত্যুর পর সেনাবাহিনী ও প্রশাসন দ্রৌপদী ও তার স্বামীকে খুঁজে বেড়ায়। তারা জঙ্গলে আশ্রয় নেয়, দিন কাটে নিরন্তর পালিয়ে বেড়িয়ে। এই পালিয়ে থাকার মধ্যেই সেনাবাহিনীর হাতে দুলনের মৃত্যু ঘটে।

> "তেমনি এক তল্লাশকালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও ৩০৩-র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দু'হাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে 'মা-হো' বলে সফেন রক্ত উদ্গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সে-ই কুখ্যাত দুলন মাঝি।"[৯]

দুলনের মৃত্যুর পর সেনাবাহিনী দ্রৌপদীকে খুঁজে পায়। কিন্তু তাকে হত্যা না করে, সেনানায়ক ও তার সৈন্যরা তাকে ধর্ষণ করে। একের পর এক সৈন্যের লালসার শিকার হয় সে। সেই নির্মমতা, সেই পশুত্ব তাকে শারীরিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে।

> "ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নীচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিকমতো বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেননায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, বৃক্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন? চার/পাঁচ-ছয়/সাত-তারপর দ্রৌপদির হুঁশ ছিল না।"[১০]

ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যেও দ্রৌপদী দমে যায় না। বরং সেই ঘটনার পর সে আরও সাহসী ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। যন্ত্রণা তাকে ভাঙতে পারে না, সে আঘাত থেকে ওঠে দাঁড়ায় আরও দৃঢ়ভাবে। একান্ত সাহসিকতার সঙ্গে, রক্তাক্ত শরীরে দাঁড়িয়ে সে রাষ্ট্রশক্তিকে উপহাস করে, সেনানায়কের পুরুষত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

> "হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মতো ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুতু ফেলতে সেনানায়কের (সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুতু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুম নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্-?দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিবস্তু টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[১১]

এই মুহূর্তে দ্রৌপদী কেবল একজন ধর্ষিতা নারী নয়, সে প্রতীক হয়ে ওঠে রাষ্ট্র ও পুরুষতান্ত্রিক সহিংসতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের। তাঁর লজ্জাহীন দৃষ্টিতে সেনানায়ক পর্যন্ত থমকে যান। তার নগ্নতা, যা ছিল শোষণের অস্ত্র, এখন তা-ই হয়ে ওঠে ক্ষমতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী প্রতীক। 'দ্রৌপদী' কেবল একটি গল্প নয়, এটি আদিবাসী সমাজের, নারীর, এবং শোষিতের সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পে এক ধর্ষিত নারীকে কেবল দুর্বল করে দেখাননি বরং তাঁকে রূপ দিয়েছেন এক প্রতিবাদী শক্তির। দ্রৌপদীর নিপীড়নের ইতিহাসই তাকে করেছে আরো বলিষ্ঠ। এই রচনায় স্পষ্ট হয়, একজন নারীর আত্মমর্যাদা, তার প্রতিবাদী কণ্ঠ, এমনকি তার নিরাবরণ শরীরও একদিন রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে। দ্রৌপদী তাই শুধু একজন চরিত্র নয়, সে এক অনন্ত প্রতীক—জেগে ওঠা মানুষের চেতনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া এক মূর্তিমান বিদ্রোহ।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলি কল্পনার গণ্ডি ছাড়িয়ে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে, যেখানে জাতপাতের বৈষম্যের পাশাপাশি শোষণমূলক সামাজিক বাস্তবতাও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আলোচ্য ছোটগল্প 'বিছন' এমনই এক বাস্তব প্রেক্ষাপটে রচিত। গল্পে মূলত নিম্নবর্গের জনজাতিদের উপর উচ্চবর্গের পীড়নের প্রতিফলন ঘটেছে। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে নিম্নবর্গের মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়ে উচ্চবর্গের প্রতিনিধি জমিদার নিজের ইচ্ছেমতো চালনা করে। গল্পের জমিদার চরিত্র লছমন সিং সেই উচ্চবর্ণীয় ক্ষমতাধর শ্রেণির প্রতীক, যিনি নিজের স্বার্থে গরিব ও অসহায় মানুষদের জীবনকে একপ্রকার পণ্যে পরিণত করেন। অন্যদিকে, গল্পের প্রধান চরিত্র দুলন গঞ্জু সেই মানুষদের প্রতিনিধি, যারা দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতিত, কিন্তু একসময় প্রতিবাদ গড়ে তোলে এবং নিজের অধিকার ও মর্যাদার জন্য রুখে দাঁড়ায়। গল্পে উল্লেখিত গ্রাম কুরুডা ও হেসাডি, যেখানে বৃষ্টি পড়ে না, ঘাস জন্মায় না, মাঝে

মাঝে ফণীমনসার জঙ্গল দেখা যায়। এই গ্রামে দুলন গঞ্জু এক রহস্যময় জীবন যাপন করে। প্রতিদিন রাতে বন পাহারা দিতে সে মাচানে উঠে অনাবাদি জমিতে রাত কাটায়। দুলন গঞ্জু জমিটি আসলে জমিদারের দয়ায় পায় না, বরং তাকে শাসিয়ে সেই জমির মালিক বানানো হয়।

> "সে সময় দুলন গঞ্জু উক্ত জমিটি পায়। জমিটি সে নিতে চায়নি। কিন্তু লছমন সিংয়ের প্রতাপ অত্যন্ত বেশি। সে চোখ রাঙিয়ে বলল, 'একেই বলে ছোটলোক।"[১২]

আসলে জমিটা চাপিয়ে দেওয়ার পিছনে লছমন সিংয়ের একটি বড় মতলব ছিল। তাকে জমির মালিক করে দুলনকে একপ্রকার ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পেটের দায়ে দুলন সেই জমির উপরে ভরসা করে বছরে পর বছর সরকার থেকে বিছন ধান আনে। গ্রামের পহানের গরু দেখিয়ে সরকার থেকে প্রতি বছর টাকা আদায় করে। গল্পে দেখা যায় লছমন সিং সামান্য পয়সায় ধমক দিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করাতো।

> "পঁচিশ পয়সা বাড়াবার জন্যে গ্রামবাসীরা খুব আগ্রহী। সব জেনেও হাঙ্গামা বাধলে এস. ডি. ও. পুলিশ নিয়ে এসে কিষানদেরই ধরে নিয়ে যান। লছমন সিং দৈতারিকে কিছু বলেন না।"[১৩]

করণ ও তার ভাই বুলাকি প্রতিবাদ করায়, তাদের হত্যা করে দুলনেরই জমিতে পুঁতে ফেলা হয়। এবং পাহারাদার হিসাবে রাখা হয় দুলনকে।

> "করণ ও তার নির্বিরোধী ভাই বুলাকির লাশ, লছমনের বন্দুকের নির্দেশে দুলন জমিতে পোঁতে। সভয়ে, মাথা নিচু করে কোদালে কুপিয়ে গভীর গর্ত খুঁড়ে। লছমন পাড়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করে ও পান চিবোয়। তারপর বলে, 'একটা কথা বলবি তো কুত্তা, করণ দুসাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব।"[১৪]

করণ ও বুলাকি শুধু দুটি নাম নয়, তারা একেকটি প্রতিবাদের প্রতীক, যাদের স্মৃতি গ্রামের মানুষের কাছ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। লছমন সিং এই হত্যাকাণ্ড চাপা দিতে গ্রামে হনুমান মন্দিরে শিবের মাথায় সোনার সাপ গড়িয়ে দেয়। বিডিওকে স্কুটার এবং দারোগাকে ট্রানজিস্টর উপহার দেয়। মৃত্যুর পরও করণ-বুলাকির পরিবারের দেড় বিঘা জমি ঋণের অজুহাতে দখল করে নেওয়া হয়। তবুও মজুরদের পয়সা বাড়ানো হয় না। বরং আট দিনের দিন বাইরে থেকে মজুর এনে লছমন সিং ধান কাটাতে শুরু করে এবং বন্দুকের সাহায্যে প্রতিবাদ দমন করে।

> "উক্ত মস্তানরা কথা দিয়েছে, বন্দুক হাতে ওরা ফসল কাটিয়ে নেবে এবং যে ট্যাঁ-ফোঁ করবে, তার চামড়ায় পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে এ অঞ্চলে বদমায়েশি চিরতরে ঘোচাবে।"[১৫]

দিনের পর দিন এই নির্যাতন চলতে থাকে। হঠাৎ করেই দেখা যায় দুলনের ছেলে ধাতুয়াকে হত্যা করে তার পিতার অনাবাদি জমিতে পুঁতে ফেলা হয়। উপরন্তু দুলনকে আবারও মৃত্যুর ভয় দেখানো হয়।

> "হ্যাঁ, কিন্তু জবান খুলবি না দুলন। তাহলে তোর বউ, বেটা, বেটার বউ, নাতি—কেউ থাকবে না। ঔর টাকা নিয়ে যাবি। পুলিশ ডেকেছে তোর ছেলে। পুলিশকে আমি জরুর কিনে নেব। কিন্তু জানিস, তোর ছেলে বলেই লাটুয়াকে ছেড়ে দিয়েছি। আমার বন্দুকের একটা গুলিও তো আজ খরচ করি নি। লাটুয়াকে একটা গুলিতে ফেলে দিতে পারতাম। দিই নি।"[১৬]

ছেলেকে হারিয়ে দুলন অবশেষে উন্মাদের মতো আচরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার মনে ধীরে ধীরে প্রতিবাদের বীজ জন্ম নেয়। একদিন যখন লছমন একা আসে দুলনকে শাসাতে, তখন সেই সুযোগে দুলনের হাতে লছমনের মৃত্যু হয়।

> "লছমন উঠতে গেল সর্বশক্তিতে, চেঁচাতে গেল, বাঁ হাতে পাথর নিতে—গোল মুখে বলল, কা আপশোস মালিক! গঞ্জুর হাতে মরলে! পাথর দিয়ে ছেঁচতে থাকল ও লছমনের মাথা। ছেঁচে চলল।"[১৭]

ধাতুয়া, করনের মত একদিন লছমন ও হারিয়ে গেল, দুলনও ধরা পড়ল না। এভাবেই এক নীরব, কিন্তু তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে শোষকের পতন হয়।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' গল্পে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে গরিব ও নিম্নবর্গের মানুষের উপর দিনের পর দিন অন্যায় ও শোষণ চলতে থাকে। কিন্তু সেই সহ্য করারও একটা সীমা থাকে। দুলন গঞ্জু প্রথমে ভয় পায়, চুপচাপ সহ্য করে কিন্তু নিজের ছেলেকে হারিয়ে আর চুপ থাকতে পারে না। এক সময় সে প্রতিবাদ করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়ায়। এই গল্প আমাদের শেখায়, যতই ক্ষমতাবান হোক শোষক, তার অন্যায় চিরদিন টিকে না। নির্যাতিত মানুষ একদিন প্রতিবাদ করতে শেখে, আর সেই প্রতিবাদই হয়ে ওঠে পরিবর্তনের শুরু।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখার স্তরে স্তরে পাঠক নিজেকেই খুঁজে পায়। কারণ লেখিকা নিজেই সেই সমাজের অন্তর্গত ছিলেন যেখানে বাস করতো নিম্নর্বগ ও অন্তজ শ্রেণির মানুষ। দিনের পর দিন বছরের পর বছর কাটিয়েছেন তিনি সমাজের অবহেলিত মানুষদের একজন হয়ে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের জীবন প্রণালী, তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের কষ্ট তিনি নিজের ভেবে লড়াই করে গেছেন শোষক শ্রেণীর বিরূদ্ধে। তাঁর সাহসিকতায় পরিবর্তন করতে চেয়েছেন অন্যায় অত্যাচার। তিনি মানবিকতার খাতিরে তীব্র প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় শোষকের নির্মম অত্যাচার যেমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি তার লেখায় প্রতিবাদী মনভাবনারও শক্তিশালী প্রতিফলন ঘটেছে। অন্যান্য লেখকদের মতো তিনিও সার্থকভাবে গল্পে বাস্তব সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। শুধু লেখার মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং লেখার গণ্ডি পেরিয়ে যখনই সম্ভব হয়েছে, শোষিতদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মানবতার মধ্যে মানুষের জয়গান গেয়েছেন এবং সমাজকে শোষকের বিরুদ্ধে সচেতন ও জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী শুধুমাত্র একজন সাহিত্যিক নন, বরং একজন সমাজসেবক এবং নির্ভীক কণ্ঠস্বর হিসেবে আজও স্মরণীয়। তাঁর লেখার মাধ্যমে তিনি সমাজের বিবেককে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, শোষকের মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন এবং একটি সাম্যবাদী ও মানবিক সমাজ গঠনের প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর লেখা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সাহিত্যের দায়িত্ব হল, কল্পনার বাইরে ও সত্যকে উদঘাটন করা, যা মানবিকতার খাতিরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালাবে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ। মহাশ্বেতা: নানা বর্ণে ও নানা রঙে। দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪-১/A বেনিয়াতলা লেন, কলকাতা, ৭০০০০৯, পৃ: প্রতিবেদন ৩।
২. তদেব, পৃ: ২০।
দেব, মহাশ্বেতা। শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ পৃ: ২০৯।
৩. তদেব, পৃ: ২০৯।
৪. তদেব, পৃ: ২১০।
৫. তদেব, পৃ: ২১৬।
৬. তদেব, পৃ: ২১৬।
৭. তদেব, পৃ: ৬৭।
৮. তদেব, পৃ: ৬৭।
৯. তদেব, পৃ: ৬৩।
১০.তদেব, পৃ: ৭০।
১১.তদেব, পৃ: ৭১।
১২.তদেব, পৃ: ১৬১।
১৩.তদেব, পৃ-১৬৪।
১৪.তদেব, পৃ: ১৬৫।
১৫.তদেব, পৃ: ১৭০।
১৬.তদেব, পৃ: ১৭৪।
১৭.তদেব, পৃ: ১৭৭।

আকরগ্রন্থ:

১) দেবী, মহাশ্বেতা। শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ। মহাশ্বেতা: নানা বর্ণে ও নানা রঙে। দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪-১/A বেনিয়াতলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।
২. ঘোষ, ড. বিজিত। বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদি চেতনা। পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা, ৭০০০১০।
৩. ভট্টাচার্য, ইন্দিরা। মহাশ্বেতা দেবী মননে ও সৃজনে। স্কলার পাবলিকেশন, করিমগঞ্জ, আসাম, ৭৮৮৭১১।
৪. দত্ত, শিপ্রা। মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন। অক্ষর পাবলিকেশন্স, জগন্নাথ বাড়ি রোড আগরতলা ত্রিপুরা এবং ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২।
৫. মুখোপাধ্যায়, ড. তরুণ। বাংলা ছোটগল্প: পর্ব-পর্বান্তর অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা, ৭০০০০৯।